বর্ধমান জেলার লৌকিক দেব-দেবী

সর্বজিৎ যশ

কথামুখ ঃ পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই লৌকিক দেবদেবী সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি তথা ধর্মীয় মানসিকতার প্রকৃত স্বরূপটি উপস্থাপিত করে। লোকধর্মে প্রতিফলিত হয় খেটে খাওয়া মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি। সুদূর অতীতে জীবন যখন ছিল অনিশ্চয়তা ও সংশয়াচ্ছন্ন, তখন আমাদের প্রপিতামহেরা কল্পনা করেছিলেন ইহজাগতিক সকল বস্তুর পশ্চাতে অসংখ্য অলৌকিক পরিচালিকা শক্তির। এইভাবেই জন্ম নিয়েছিল ধর্ম আর কল্পিত হয়েছিলেন লৌকিক দেবদেবীরা, এই দৃশ্যমান জগতের জড় থেকে জীবজগৎ প্রত্যেকেই যাঁদের নিয়ন্ত্রনাধীন। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যকে যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যায় অক্ষম ছিলেন আমাদের পূর্বসূরিরা। তাঁদের ভাবনায় প্রকারান্তরে নদ-নদী, গাছপালা, পাহাড়-পর্বতের একজন করে অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর সৃষ্টি করেছিলেন। এদের সহায়তায় প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে স্ববশে এনে আপৎকালীন অবস্থায় যেমন মুক্তি পাওয়া যায়, তেমনি এঁদের সন্তুষ্টিবিধানে মেলে শস্য, সম্পদ আর সন্তান। এইভাবে গড়ে-ওঠা অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী আর তাঁদের পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আচার, বিশ্বাস আর সংস্কার ছড়িয়ে রয়েছে বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, যার ওপর বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসও অনেকাংশে নির্ভরশীল।

আর্যেতর সংস্কৃতির পীঠস্থান বাংলার মানুষের প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এভাবেই। কিন্তু কোন কামনার বশীভূত হয়ে একসময় এদেশের মানুষ শুরু করেছিল মাতৃকা উপাসনা? এখানেও সেই একই ভাবনার প্রতিধ্বনি যা দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে সমস্ত মানুষের অন্তরে নিরন্তর প্রবাহিত — 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'। ইচ্ছাপূরণের এই জাদুদণ্ড যার একটি মাত্র অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হয়, স্বপ্ন হয় বাস্তব, তিনি 'মা' ছাড়া আর কেই বা হতে পারেন! বিশ্বের দরবারে তিনি মহামাতৃকা। তিনিই সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার বিনাশও করে থাকেন। রাঢ়ের সহজ সরল মানুষেরা এই মাকে কল্পনা করেছে নানাভাবে, দিয়েছে নানা নাম। আয়োজন করেছে বিভিন্ন পুজো পদ্ধতির। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও নির্জন প্রান্তরে, খোলা আকাশের নিচে বা নদীর তীরে, গাছের তলায়, সিঁদুর-লেপা পাথরের খণ্ড বা স্তূপকৃত মাটির হাতিঘোড়া এঁদের প্রতীক। এঁদের পুজোয় উচ্চারিত হয় না কোনও বৈদিক মন্ত্র, প্রয়োজন হয় না কোনও ব্রাহ্মণ

পুরোহিতের। অন্তরের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দিয়ে সমষ্টিগতভাবে মানুষ প্রার্থনা জানায় মাকে — আমার জমিতে যেন প্রচুর ফসল হয়, আমার গোষ্ঠীর নারীদের যেন সন্তান-সন্ততি হয়, গবাদি পশুর যেন অনেক বাচ্চা হয়। সকলের শরীর যেন সুস্থ থাকে ইত্যাদি।

বিভিন্ন দেব-দেবী নিয়ে লৌকিক বিশ্বাস সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে রয়েছে। লোকউৎসবে সকল সম্প্রদায় এক জায়গায় জড়ো হয়। সকলে আনন্দ করে। কোথাও মেলা বসে। ওই সব নিয়ে মুখে মুখে ঘোরে কত কিংবদন্তি। কোথাও রচিত হয় ছড়া ও গান। জড়ো হয় বাউল, ফকির। পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামে লৌকিক ঐতিহ্যরূপে বহু অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো বর্ধমান জেলারও অনেক গ্রামে রয়েছে বহু দেবদেবীর থান। কোথাও গাছতলায়, কোথাও গ্রামের পথের ধারে - চালাঘরের মধ্যে। ওই সব লোকদেবতার একটি বিরাট অংশ ব্রাহ্মণ্য উপাসক সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। লৌকিক দেব-দেবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায় বহু বৈচিত্রময় লোককথা। এখন আমরা বর্ধমান জেলার লৌকিক দেবদেবীর থানগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

রংকিনী দেবী ঃ পশ্চিম সীমান্ত বাংলা সহ বৃহত্তর রাঢ়ের অসংখ্য স্থানে রংকিনী নামক এক লৌকিক দেবীর সাড়ম্বরে পূজার্চনা হয়। ধলভূম রাজবংশের কুলদেবী রংকিনী। বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার রংকিনী মহল্লায় এই দেবীর নিত্যপুজো হয়। বিশেষ পুজো ফাল্গুন মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত তিনমাস। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে দেবীর চড়ক উৎসব। একসময় এখানে নরবলি হত। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর', জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি পত্রিকায় এ নিয়ে আলোড়ন ওঠে। দুর্গার ধ্যানে এই দেবীর পুজো হলেও বাস্তবে রংকিনী আদিম গ্রাম্য লৌকিক দেবী। তাঁর আপাত-কালীকামূর্তি দুর্গাতন্ত্র বৌদ্ধকৃত্য অথর্ব সংস্কার ভেদ করে সেই আদিম গ্রাম্য ভয়ংকরী রক্তপিপাসু বৃক্ষনিবাসিনী অনার্য অরণ্য দেবীত্বই ধরা পড়ে।

বোঁয়াইচণ্ডী ঃ বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার বোঁয়াই গ্রামের গ্রাম্যদেবী বোঁয়াই চণ্ডী এক অতি পরিচিত লৌকিক দেবী। এই দেবীর মন্দিরটি বর্ধমান মহারাজ মহাতাব চাঁদের সময়ে তৈরি। দেবীর নিত্যপূজা হয় দিনে তিনবার — সকালে আলো চাল, মিষ্টি ও ফলমূল দিয়ে। দুপুরে অন্নভোগ – ৫ পোয়া চালের ভাত, নিরামিষ ও আমিষ তরকারি দিয়ে। রাতে লুচি মিষ্টি দিয়ে শীতলারতি। পূজারী 'রায়' উপাধির ব্রাহ্মণ। এঁরা ২০/২৫ ঘর পালা করে পুজো করছেন। দুর্গার ধ্যানে ইনি পূজিতা হন – 'ওঁ জটাজুট সমাযুক্তং'....। বীজমন্ত্র 'হ্রীং'। প্রতিদিন ৪০০/৫০০ জন

যাত্রী হয়। বিশেষ পুজোর দিনগুলিতে যাত্রী ১০০০ জন ছাড়িয়ে যায়। মেলা হয় অম্বুবাচীর সময় - ৭ থেকে ১০ আষাঢ়, ৪ দিন। তখন দৈনিক ৩০,০০০ / ৪০,০০০ লোক আসে মেলায়। দূর-দূরান্তরের যাত্রীদের নাম ঠিকানাযুক্ত একটি বিরাট খাতা আছে, যা পড়লে বিস্মিত হতে হয়। শারদীয় দুর্গাপুজোর সময় ৪ দিন মহাড়ম্বরে পুজো হয়, এই চারদিনের পুজোটি অবশ্য বছর ১২০ চালু হয়েছে, পূর্বে মোষ বলি হত, তবে বর্তমানে তা বন্ধ হয়েছে। এছাড়া মন্দির সংলগ্ন মায়ের পুকুরে 'চানকরা' হয় মকরসংক্রান্তি, মাঘে মাকরী সপ্তমী ও বারুণী স্নানের দিনে। মহাষ্টমীর দিন দেবীর থানে উপস্থিত সকলকে বসিয়ে লুচি, খিচুড়ি, ভাজা ও তরকারি প্রসাদ খাওয়ানো হয়। এদিন খুব ভিড় হয়।

জগৎগৌরী দেবী ঃ বর্ধমান জেলার কালনা থানার বৈদ্যপুরের কাছে অবস্থিত নারকেলডাঙ্গার জগৎগৌরী দেবী খুবই বিখ্যাত লৌকিক দেবী। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ তাঁর 'মনসামঙ্গলে' বলেছেন যে, বেহুলা এ গ্রামেই মনসা পুজো করেছিলেন। মূর্তিটি পাথরের মনসা দেবী, এটা নাকি পার্শ্বস্থ বেহুলা নদীর দ-এ পেয়েছিল এক জেলে। এই দেবীকে লোকে বলে 'কলুর দেবী'। পূর্বে হয়তো ইনি কলুদের দ্বারাই পূজিতা হতেন, এখন পুজো করেন গ্রামের 'চক্রবর্তী' পদবির ব্রাহ্মণেরা। দেবীর নিত্যপুজো হয়। পুজো হয় একযোগে জগদ্ধাত্রী ও মনসার ধ্যানে। বার্ষিক পুজো হয় জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমী বা দশহরায়। এ সময় দেবীর রাজবেশ ও অধিবাস। এ দিনের বিশেষ আকর্ষণ চলন্ত 'নাচঘর'। গোরুর গাড়ির উপরে স্টেজ করে নারীবেশি পুরুষ নাচগান করে। গানের বিষয় মনসামঙ্গল থেকে (স্তরে স্তরে) সাজানো হয় মাটির পুতুল-কৃষ্ণ বা রামের পৌরাণিক লীলা নিয়ে তৈরি। এই থাকায় ছাঁচে ঢালা চিনির মিষ্টি সাজানো হয় - যা দেখার মতো। এই অঞ্চলে জগৎগৌরীর ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়।

দিদিঠাকরুণ ঃ বর্ধমান শহরের কাঞ্চন নগরের মালিপাড়ায় দিদিঠাকরুণ-এর অস্তিত্ব দেখা যায়। দিদিঠাকরুণ হলেন সন্তানদাত্রী ও সন্তান রক্ষয়িত্রী দেবী। রোগ নিবারণী দেবীও বটে। মালিপাড়ায় দিদিঠাকরুণের থানে দেখা যায় একটি বিরাট নিমগাছ, যার মধ্যস্থল থেকে অশ্বত্থ গাছ বেরিয়েছে, গাছের তলায় দেখা যায় পোড়া মাটির হাতি ও ঘোড়া। ষষ্ঠী ঢক নামক এক ব্যক্তি স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সারা বছর নিত্যপুজো হয়। বার্ষিক পুজো হয় – চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে পুজো স্থানের পার্শ্ববর্তী পালপুকুর থেকে স্নান করে এসে ব্রাহ্মণ পুজোয় বসেন। ঘট পুজো হয়। ছাগ

বলি হয়। পুজোর উদ্যোগ নেয় মালিপাড়া ও সায়রের পাড়ের সকল বাসিন্দা মিলে।

সতীমা ঃ বর্ধমান শহরের কাঞ্চননগরের মালিপাড়ার দিদিঠাকরুণ এর থানের পাশেই 'সতীমা' নামক এক লৌকিক দেবীর স্থান। ষষ্ঠী ঢকের মতো বাংলাদেশ থেকে এই দেবীকে নিয়ে আসেন। ছোট্ট একটি প্রস্তর খণ্ড, এই দেবীকে কেন্দ্র করে ষষ্ঠী ঢক এর পিতা-মাতা তান্ত্রিক সাধনা করতেন। বর্তমানে ষষ্ঠী ঢক নিজ উদ্যোগে নিত্যপুজো করে থাকেন, তবে ফাল্গুন মাসের হোলির দিন বার্ষিক পুজো বেশ ধুমধাম করে হয়, তখন পাড়ার মানুষদের সাহায্য পান তিনি।

ঝংকেশ্বরী দেবী ঃ বর্ধমান জেলার ভাতার থানার 'বড় পোষলা' গ্রামের গ্রাম দেবী ঝংকেশ্বরী। আসলে তা মনসার একটি রূপ। এই গ্রামের ভিতর উঁচু বেদির উপর প্রায় ৪০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এক চূড়া মন্দির। মন্দিরের ভিতর ছোট ছোট পাথরের টুকরোর মধ্যে প্রায় চার ইঞ্চি একটি কালো রঙের সাপের মাথার মতো শিলাখণ্ড চোখে পড়ে। এই শিলাখণ্ড গ্রামদেবী ঝংকেশ্বরী ধ্যানে পুজো হয়। পাশে একটি কালো পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। বড় পোষলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ছোটো পোষলা, মুসারু ও পলসোনা গ্রামে ঝংকেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। এই গ্রামগুলিতে ঝাঁকলাই নামক এক ধরনের সর্প দেখা যায়, লোকবিশ্বাস এই সর্প বিষাক্ত হলেও মানুষের কোনও ক্ষতি করে না, তবে এই সর্পের কামড়ে কখনও সখনও মৃত্যুর খবর কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি মন্দিরে নিত্যপুজো হয়। আষাঢ় মাসে বার্ষিক পুজো হয়।

আরখাই চণ্ডী ঃ কালনা মহকুমায় অবস্থিত রাণীবন্দ ও গুপ্তিপুর গ্রামের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে আরখাই চণ্ডীর মন্দির রয়েছে, এই দেবীমূর্তি অন্ততপক্ষে ২৫০ বছরের পুরাতন বলে বিশেষজ্ঞগণ মতামত প্রকাশ করেছেন। এই স্থানটি একসময় বিজুবনে পূর্ণ ছিল। এক সাধক ওই স্থানে পঞ্চমুণ্ডির আসন করে সাধনায় দেবীকে জাগ্রত করেছিলেন। দেবীর প্রাচীন বিগ্রহটি অপহৃত হওয়ার পর কোনও সময় বর্তমান মূর্তিটি ১৫/১৬ ইঞ্চি দীর্ঘ সিংহাসনে সমাসীনা চতুর্ভূজা-পিতল নির্মিত। দেবীর হাতে কোনও আভরণ নেই। ইনি 'আরখাই চণ্ডী' নামে খ্যাত। কিংবদন্তি অনুসারে দেবী চণ্ডী এক জেলের দ্বারা প্রথমে পূজিতা হতেন। আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে দেবীর বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে বাজি পুড়িয়ে বাদ্য সহকারে মই মাথায় করে পূজা আনা হয়, এ উপলক্ষ্যে ৫/৭ দিন মেলা চলে।

সারগড়িয়ার শীতলা ঃ কালনা মহকুমার ধাত্রীগ্রামের কাছে সারগড়িয়া গ্রামে

শীতলার অধিষ্ঠান। দেড়শত বৎসরের অধিককাল ওই গ্রামে শীতলার পূজা হয়। দেবীর কোনও স্থায়ী মূর্তি নেই। একটি মনসা (সিজ) গাছ ও একটি নিমগাছের নিচে একটি পাকা বেদিতে দেবীর অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। বার মাসই ওই স্থানে মানসিক পূজা হয়। বৈশাখের শুক্লা চতুর্দশীতে ওই স্থানেই একটি পাকা ঘরে গর্দ্দভাসীনা চতুর্ভূজা রক্তবসনা উগ্ররূপা মৃন্ময়ী শীতলা মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা হয়। দেবীর অধঃস্থ দক্ষিণ হস্তে সম্মার্জনী। দেবীর সেবাইত মজুমদার বংশ। এই সময়ে পার্শ্ববর্তী ১৫/২০ টি গ্রাম থেকে মই অথবা মাথায় বাদ্য সহযোগে বাজি পুড়িয়ে দেবীর পুজো আনা হয় ছাগ ও মেষ বলিদান হয়। বেশ বড় মেলা বসে, যা ৩/৪ দিন চলে।

সুকুরের ওলাইচণ্ডী ঃ রায়না থানার নতু পঞ্চায়েতের অধীন সুকুর গ্রাম। গ্রামটিতে উগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বায়েন, দুলে ও সাঁওতাল জনজাতির মানুষের বসবাস। এই গ্রামের ওলাইচণ্ডীর বিশেষ খ্যাতি আছে। প্রতি বছর নবান্ন'র পরের দিন, এগারোই অগ্রহায়ণ হয় এই দেবীর বার্ষিক পুজো। দেবীর ঘট আনা হয় গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত 'উচিত খাঁ' নামের পুকুর থেকে। পুজোর দিন সকালে গ্রামের সকলে দলবেঁধে হরিনাম করতে করতে যান ঘট আনতে। ঘট স্থাপন হবার পর গ্রামের বিভিন্ন পরিবার থেকে পুজো আসে। ব্রাহ্মণদের পুজো প্রথমে আসে। দেবী রক্তবিপাসু, তাই দেবীকে তুষ্ট রাখতে পশুবলি আবশ্যক, মানতের বলি বাদে গ্রামে বারোয়ারী থেকেও দেওয়া হয় একটি ছাগবলি। সব থেকে ধুমধামের সঙ্গে আসে বায়েন ও দুলে পরিবারের পুজোগুলি। পুজোর দিন শেওড়াফুলির গঙ্গা থেকে জল এনে নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই গ্রামে বর্ধমান মহারাজ তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠিত শিবের মাথায় ঢালার রীতি আছে। এই পুজো উপলক্ষে চারদিনের মেলা বসে।

ডাকাইচণ্ডী ঃ আসানসোল মহকুমার কুলটি রেল স্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে গাঙুঠিয়া গ্রামের পূর্বদিকে বিস্তৃত ধান মাঠের এক প্রান্তে বিশাল এক বটবৃক্ষ ও আখড়া গাছের তলায় ডাকাই চণ্ডীর অবস্থান। দেবীর কোনও স্থায়ী মন্দির নেই। দেবীর থানের আশেপাশে পাথরের ভগ্নস্তূপ, ভগ্নমূর্তি বিদ্যমান। সামনেই একটি খাল রয়েছে, তবে বর্ষাকাল ছাড়া সেখানে জল থাকে না। দেবীর নিত্যপূজা হয়। আষাঢ় সংক্রান্তিতে ছাগ বলিদান সহ বাৎসরিক পুজো হয়। প্রচুর লোকসমাগম হলেও কোনও মেলা হয় না।

বাবা বোকাপাহাড়ি ঃ গাঙুঠিয়া গ্রামেই একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের তলায় বাঁধানো সিমেন্টের চাতালে রয়েছেন বাবা বোকাপাহাড়ি। কোনও মন্দির নেই, সামনে একটি তুলসী মঞ্চের ওপর ঝাঁকড়া মাথা তুলসী গাছ। বোকাপাহাড়ির কোনও

মূর্তি নেই। দেবতার প্রতীক বলতে ত্রিশূল ও খড়ম। চারিদিকে ধান খেতের মাঝে বোকাপাহাড়ির থান, যে কোনও দিন পূজারিকে ডেকে পূজা দেয়। বাৎসরিক পূজা হয় মাকুড়ি সপ্তমী ও মকর সংক্রান্তির দিনে। খিচুড়ি, পায়েস, গুড়, চিড়ে, কলা, বাতাসা, দুধ সহ ফলমূল দেবতার ভোগ হিসাবে দেওয়া হয়।

মুক্তাইচণ্ডী ঃ সালানপুর থানার মুক্তাইচণ্ডী পাহাড়ে অধিষ্ঠিত দেবী মুক্তাইচণ্ডী। দেবী প্রায় এক ফুটের মতো লম্বা, ছয়টি ঘোড়ায় টানা কারুকার্যময় রথের উপর ধনুর্বাণ হাতে এই স্ত্রী মূর্তিটিই মুক্তাইচণ্ডী। তবে অনেকেই এই মূর্তিকে আদি চণ্ডী বলে স্বীকার করেন না। প্রাক্-আর্য যুগে সিঁদুর লিপ্ত পাথরেই আদি চণ্ডী শিলার পূজা হত। পরবর্তীকালে ভুঁইয়া রাজাদের দ্বারা সম্ভবত এটির রূপান্তর ঘটে, মুক্তাইচণ্ডী আদিতে আদিবাসীদের দ্বারা পূজিতা হতেন। শিকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এই পাহাড় ও অরণ্যটি বেছে নিয়ে বসবাস করত এবং শিকার করত, সম্ভবত তারাই মুক্তাইচণ্ডী পাহাড়ে এই দেবীকে স্থাপন করেন। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় বার্ষিক পুজো উপলক্ষ্যে মেলা বসে। প্রচুর জনসমাগম হয়।

কর্কট নাগ ঃ মঙ্গলকোট থানার কাঁকোড়া গ্রামে কর্কটনাগের অবস্থান। অতীতের কঙ্কননগর বা কঙ্কননগরই বর্তমানের কাঁকোড়া। এই গ্রামের লৌকিক দেবী কর্কটনাগ গ্রামের পূর্ব সীমান্তে একটা বটগাছের নিচে অবস্থান করছেন। অষ্টনাগের অন্যতম এই কর্কটনাগ — 'অনন্ত ঃ বাসুকি ঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ / কুমীরঃ কর্কটঃ শঙ্খোঃ হ্যষ্টনাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ'। দশহরার পর যে নাগপঞ্চমী, সেই দিন এখানে কর্কটনাগের বাৎসরিক পুজো ও উৎসব। পুজো শুরু হয় বৈকাল ৩ ঘটিকায়, কারণ হিসেবে বলা হয় কর্কটনাগ পূর্বে অনার্য বা বাগ্‌দীদের পূজ্য ছিল। পুরোহিত শূদ্র যাজক। তাঁর বাস ইছাপুর গ্রামের প্রায় একমাইল পশ্চিমে। সেখানকার পুরুত পাশের গ্রামের পুজো সেরে তবে কর্কটনাগের পুজো করতে আসতেন, তার আসতে বেলা ৩টে হয়ে যেত, সেই ট্রাডিশন আজও বজায় আছে। পুজোর দিন বাগ্‌দী সম্প্রদায়ের মানুষ উপোষ করে। বেলা ১টা থেকে বাগ্‌দীদের স্ত্রী-পুরুষগণ মিলে বাদ্যসহ পুজোতলায় উপস্থিত হয়। ফলমূল নৈবেদ্য এবং বলি দেবার জন্য পাঁঠা নিয়ে তারা হাজির হন এবং বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করেন। বৃক্ষের ঈশাণ কোণে একটা হোমকুণ্ড আছে। সেখানে ব্রাহ্মণদের পুজো ও হোমের অধিকার। এরপর উগ্রক্ষত্রিয়দের, তারপর বাগ্‌দীদের। নাগপূজা সাধারণ শাস্ত্রীয় নিয়মেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে সারাবছর এদিনটি ছাড়া অন্য কোনওদিন পুজো হয় না।

কালিপাহাড়ী মঞ্চুলার ব্রাহ্মণী ঃ ভাতার থানার কালিপাহাড়ী ও মঞ্জুলা দুটি

পাশাপাশি গ্রাম। এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাহ্মণী। এক ফুট উঁচু শিলাময়ী হংসরূঢ়া ব্রাহ্মণী দেবী। কালিপাহাড়ী মঞ্জুলা থেকে যে নালার মূলধারা মঙ্গলকোট ও কাটোয়া থানার সীমারেখা রচনা করে খড়ি নদীতে মিশেছে তার নাম ব্রাহ্মণী নদী। এই ব্রাহ্মণী দেবীর নামানুসারে এই নদীর নাম। এই ব্রাহ্মণী দেবী মনসা রূপে পুজো পান। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণ নবমী তিথিতে দেবীর বাৎসরিক পুজা হয়, বেশ কিছু বলিদান হয় একটি ছোটখাটো মেলা বসে।

কুলনগরের কুলচণ্ডী ঃ ভাতার থানার কুলনগর (জে. এল. নং - ৯৫) ও কুলচণ্ডা ৯৬৫) পাশাপাশি গ্রাম। কুলনগরের খ্যাতি কুলচণ্ডী বা কুলাইচণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্যের জন্য। দেবীমূর্তি খাঁটি কষ্টিপাথরে নির্মিত দ্বিভূজা জয়দুর্গা মূর্তি — এক হস্তে গদা অন্য হস্তে ঢালের মতো কোনও অস্ত্র। পালযুগের শিল্পশৈলীতে গঠিত অপরূপা মূর্তি। নিত্য সেবার ব্যবস্থা আছে। নিত্য পাঁচপোয়া চালের অন্নভোগ হয়। সন্ধ্যায় শীতলারতি। আষাঢ়ে নবমীতে মহাপুজো, অজস্র পাঁঠা বলি হয়। জাগ্রত দেবী কুলচণ্ডী, দেবীর কাছে মানত করলে দেবীর নির্মাল্য ধারণ করতে বাত, হাঁপানির মতো দুরারোগ্য রোগ নিরাময় হয় বলেই ভক্তদের ধারণা। তবে কুলনগরে দেবীর যে মূর্তি আছে সেটি দেবীর পূর্ণাঙ্গ মূর্তি নয় — ঊর্ধ্বাঙ্গ মাত্র। নিম্নাঙ্গের পুজো হয় কুলনগরের উত্তরে ঊষাগ্রামে।

উচ্চৈশ্বরী ঃ মাধবডিহি থানার একটি অতি প্রাচীন গ্রাম উচালন। এই গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় বাগদে পুকুরের অগ্নিকোণে একটি নিমগাছের তলায় বাঁধানো বেদিতে অধিষ্ঠাতা দেবী উচ্চৈশ্বরী। মূর্তিটি কালো কষ্টিপাথরের তৈরি। উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট, ঊর্ধ্বাংশ কিঞ্চিৎ ভগ্ন, মূলমূর্তি প্রায় আড়াই ফুট উচ্চ বীণাবাদনরতা কষ্টিপাথরের দণ্ডায়মান মূর্তি। এই মূর্তির মাথার ওপর ও পদতলে পদ্ম, তার নিচে হনুমান মূর্তি। এই দুই মূর্তির দুপাশে দুটি ছোট ছোট মূর্তি — একটি ডান দিকে হেলানো কিছুর ওপর ডান হাতের কুনুই -এ ভর দিয়ে ও বাম হাত কোমরে দিয়ে দণ্ডায়মান, আর বাঁদিকের ছোট মূর্তিটি সোজা দণ্ডায়মান। নিমগাছটি উচ্চৈশ্বরীর প্রতীক রূপে পূজিতা হন। উচ্চৈশ্বরীর পুজো হয় কালিকার ধ্যানে – যদিও কালী মূর্তির সঙ্গে এই মূর্তির কোনও সাদৃশ্য নেই। বৈশাখ কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে মঙ্গলবার কিংবা শনিবার বার্ষিক পুজোর দিন স্থির হয়। তবে মহাপুজোর দিন পূর্বাহ্নে খণ্ডঘোষ থানার বোঁয়াই গ্রামে দেবী বোঁয়াইচণ্ডীর পূজার নৈবেদ্য ও পাঁঠা পাঠিয়ে দিতে হয় অথবা পুজোর আনুমানিক ক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই গ্রামের সকল সম্প্রদায় জাগ্রত দেবী উচ্চৈশ্বরীর কাছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণ কামনায় মানত করে, বারব্রত

করে ও পাঁঠা বলি দেয়। 'বিশ্বভারতী পুঁথি'র একটি অংশ এখানে উল্লেখযোগ্য —

"সত্যের গঙ্গা দামুদর তরে পার হঞা
ডড়্যাগড় কামালপুর দক্ষিণে রাখিঞা
বন্দিল দরিয়ার পীর মস্তকে ইনাম।
বার ক্রোশ জুড়ো জাঁহাঁর মকাম।
বাম ভিতে নাউর গ্রাম দক্ষিণে আরি
আমিলার সবাই দিঞা পালা মঙ্গল মারি।।
মণ্ডমালা মহাস্থান পাঞ্জাত করিঞা
উচালন দীঘির পছিম পাড় দিঞা।।"

আংসিং বাংসিং ঃ কুলটি থানার অন্তর্গত হাতিনল গ্রামের ডাঙালপাড়ায় রয়েছেন আংসিং বাংসিং দেবতা। ডাঙালপাড়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মেঝের ডাঙাতে আংসিং বাংসিং এর থানটি অবস্থিত। দক্ষিণে একটি পুষ্কুরিণী। বছর তিরিশেক পূর্বে সিমেন্ট দিয়ে থানটি বাঁধানো হয়েছে, তার আগে থানটি মাটির বাঁধানো ছিল। আংসিং বাংসিং এর প্রতীক বলতে বাঁধানো ছবি। চতুর্ভূজ ত্রিনয়ণী। মূর্তির দু-পাশে দুটি বাঘ ও দুটি সাপ রয়েছে। দেয়াশির কাজ করে আসছেন বাগ্‌দী জনগোষ্ঠীর মানুষ। পৌষ পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পূজার সময় ঢাক-ঢোল, বাদ্য ভাণ্ড ধ্বনিতে পূজা মণ্ডপ জমে ওঠে।

আঁদাড়া ঠাকুর ঃ কুলটি থানার অন্তর্গত গাঙুটিকুলি গ্রাম, বরাকর নদের ধারে এই গ্রামে বসবাসকারী জেলে সম্প্রদায়ের মানুষদের আরাধ্য দেবতা আঁদাড়া ঠাকুর। গ্রামর মধ্যস্থলে একটি ফাঁকা জায়গায় বাবার স্থানটি সিমেন্টে বাঁধানো। বাবার থানে রয়েছে একটি নিম ও একটি আঁখড়া গাছ। বাবার প্রতীক শিলা। আর আছে পোড়ামাটির ঘোড়া, ত্রিশূল, গঞ্জিকা সেবনের কলকে। আঁদড়া ঠাকুর পুরুষ দেবতা। দেবস্থানের পশ্চিমে গ্রাম্যপথ। এই এলাকায় মানুষজন এই গ্রাম্যপথকে বলে 'কুলি'। পাশেই আছে গদগাছ। জনশ্রুতি গদগাছের সঙ্গে নাকি সর্প দেবতার সম্পর্ক আছে। আঁদাড়া ঠাকুরের নিত্য পুজো হয়। পুজো করেন ধীবর পদবিযুক্ত জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ। ঠাকুরকে নৈবেদ্য দেওয়া হয় চিড়ে, গুড়, দুধ, কলা, পোড়া, মণ্ডা ইত্যাদি। পাঁঠাবলি প্রথা আছে, পুজোর সময় ধূপ-ধুনো দেওয়ার রীতি আছে। ধীবর পরিবারের লোকরাই পালাক্রমে আঁদড়া ঠাকুরের নিত্য পুজো চালায়।

কাণ্ডেশ্বর ঃ বারাণসী থানার অন্তর্গত সরিষাতলির জঙ্গলে কাপিষ্টা মৌজায় কাণ্ডেশ্বরের অবস্থান। ইনি পুরুষ দেবতা। কেউ কেউ বলেন ইনি শিবের প্রতীক। কাণ্ডেশ্বরের কোনও মন্দির নেই। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি বটবৃক্ষতলায় বিরাজমান

একটি শিলা। দেবস্থানের সামনে আঁখড়া-গইড়া নামের একটি পুকুর রয়েছে। কাণ্ডেশ্বরের মূর্তির কাছে একটি বাঘের শিলামূর্তি আছে। আসলে কাণ্ডেশ্বর বনদেবতা। আদিম মানুষরা হয়তো জঙ্গলের হিংস্র পশুর হাত থেকে বাঁচতে পশুপতিনাথ কাণ্ডেশ্বরের শরণাপন্ন হতেন। আজও জনমনে কাণ্ডেশ্বর স্বমহিমায় বিরাজমান।

ঘুরঘুরাবুড়ি ঃ কুলটি থানার অন্তর্গত গাঙুঠিয়া মৌজায় ধানখেতের ওপর ঘুরঘুরাবুড়ির অবস্থান। ধানক্ষেত্রটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হলেও দেবীর পূজক বাউরি সম্প্রদায়ের লোক, দেবীস্থানের তিন-চার কিলোমিটার উত্তরে কুলটি রেলওয়ে স্টেশন। দেবীর কোনোও স্থায়ী মন্দির নেই। পূর্বে একটি শেওড়া গাছের তলায় দেবীর অবস্থান ছিল, সেই গাছটি মরে যাবার পর একটি অশ্বত্থগাছ এর তলায় অবস্থান করছেন। সামনেই একটি তুলসী মঞ্চ, সামান্য দূরে একটি মজাপুকুর ও একটি জলভর্তি ডোবা। দেবীর জাঁক পূর্বের মতো নেই। বর্তমানে বাউরি সম্প্রদায়ের মানুষ দিয়াশী, নিত্যপুজো হয় না। কেই মানত করলে তা শোধের পুজো হয়। দেবীর ভোগ খিচুড়ি, চিড়া, গুড়, পেড়া ও ফলমূল। দেবীর দিকে পশ্চাৎ ফিরে আসা যায় না, এটাই সম্মান জানানোর রীতি।

ঘাঘরবুড়ি ঃ আসানসোল গ্রামের গ্রামদেবী ঘাঘরবুড়ি বা ঘাঘরচণ্ডী। আসানসোল দক্ষিণ থানার অধীন ঊষাগ্রামের সন্নিকটে নুনে নদীর তীরে একটি নবীন গাছের তলায় দেবীর অবস্থান। ডিম্বাকৃতি তিনটি পাঁচ-ছয় ইঞ্চি শিলা দেবীর প্রতীক। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের বন্যার পর স্থানটি বাঁধিয়ে দেওয়া হয় এবং নাটমন্দির তৈরি করা হয়। ঘাঘরবুড়ির নিত্যপূজা হয়। শনি ও মঙ্গলবারে হয় বিশেষ পুজো। পাঁঠা বলির বিধান আছে, বার্ষিক পুজো হয় পৌষ সংক্রান্তিতে।

গোঁসারাবুড়ি ঃ কুলটি থানার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামের গ্রামদেবী 'গোঁসারবুড়ি'। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে ফাঁকা মাঠে বেদির মন্দির। একটি চূড়া বিহীন একতলা পাকা ঘর, সামনেই বিশাল পুকুর এবং পাশেই একটি শিব মন্দির। দেবীর প্রতীক হিসেবে একটি দেড় ইঞ্চি মাপের ডিম্বাকৃতি শিলা, যা মাটিতে প্রোথিত। এছাড়া রয়েছে ত্রিশূল ও পোড়া মাটির ঘোড়া। দেবীর নিত্য পুজো হয়, এবং প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ পুজো হয়, চিড়া, গুড়, ফল, দুধ কলা হল দেবীর নৈবেদ্য। দেবীর সামনে পাঁঠা ও মুরগি বলি হয়।

ক্ষুদারহিড় বুড়ি ঃ গাঙুঠিয়া গ্রামেই ক্ষুদারহিড় বুড়ির অবস্থান। দেবীর কোনোও মন্দির নেই, একটি আমড়া গাছের তলায় দেবীর বেদির অবস্থান। পাশেই

শ্মশান। দেবীর প্রতীক চকচকে কৃষ্ণবর্ণের পাথর। যেটি মাটিতে প্রোথিত। মাটির উপরে ৭"-৮" দেখা যায়। বেশ কিছু পোড়া মাটির ঘোড়া আছে। দেবীর থানের পাশ দিয়ে একটি জোড় বয়ে গিয়ে বরাকর নদে মিশেছে। দেবীর নিত্যপুজো হয় না। ভক্তের মানসিক শোধ উপলক্ষে বিশেষ পুজো হয়। তবে তার কোনও নির্দ্দিষ্ট দিন-ক্ষণ নেই। দেবীকে ভোগ দেওয়া হয় ঘি, খিচুড়ি, মদ, মুরগি, চিড়া, গুড়, দুধ, কলা, পেড়া, বাতাসা, লাল, শালু ইত্যাদি। বর্তমানে পাঁঠাবলি হয় না, তবে মুরগি বলি হয়।

কুদরাবুড়ি ঃ বরাকর স্টেশনের কাছে যশাইডি মৌজায় যশাইডি গ্রামের উত্তর দিকে কুদরাবুড়ি দেবীর অবস্থান। দেবীর অবস্থান শ্যাওড়া ও আখড়া গাছের তলায়। আশে পাশে রয়েছে কয়েকটি তালগাছ। দেবীর প্রতীক একটি পাথর, যার অর্ধেক মাটিতে প্রোথিত রয়েছে। বাকি প্রায় ২ ফুট অর্ধ ডিম্বাকৃতি অংশটি উপরে রয়েছে। এছাড়াও মাটির ঘোড়া, ত্রিশূল, খড়ম ও চিমটা। দেবীর আবাসস্থলের এক দিকে রয়েছে একটি বিশাল পুকুর, অন্যদিকে রেললাইন। দেবীর নিত্যপুজা হয় না। বছরে আষাঢ় সংক্রান্তি ও আখানের দিন পূজা হয়। ষান্মাসিক পূজায় কোনও মেলা হয় না, তবে বেশ জমায়েত হয়। খিচুড়ি, পায়েস, চিড়া, গুড়, দুধ, কলা, গাঁজা, কলকে, মদ দেবীর সামনে ভোগ ও পূজা উপাচার হিসাবে দেওয়া হয়। পুজোর সময় বা মানত শোধের সময়ে অনেক ভক্ত দেবীর সামনে পাঁঠা, ভেঁড়া ও মুরগি বলি দেয়।

বড়কানবুড়ি ঃ রানীগঞ্জ থানার অধীন রতিবাটি মৌজার অন্তর্গত কাশীনাথপুর গ্রামে বড়কানবুড়ি দেবীর অবস্থান। নুনিয়া নদের তীরে তেঁতুল গাছের তলায় দেবীর আস্তানা। দেবীর প্রতীক শিলা। নিত্য পুজো হয় না। বাৎসরিক পুজো হয় পৌষ সংক্রান্তির আখানের দিন। পূর্বে বলিদানের প্রথা ছিল, তবে বর্তমানে তা উঠে গেছে। দেবীকে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় ফল চিড়ে বাতাসা ইত্যাদি। বাৎসরিক পুজোয় কোনো মেলা বসে না। সুনির্দিষ্ট কোনো দেয়াশিও নেই। শস্যোৎপাদন ও উর্বরতার দেবী হিসেবে এই দেবী পূজিতা হন।

কল্যাণেশ্বরী বা বড়বুড়ি ঃ দেবী কল্যাণেশ্বরী মন্দিরটি বরাকর ড্যামের পাশেই অবস্থিত। তিনটি পূর্বমুখী পাথরের চালাঘর মন্দিরের গঠন। বাইরে থেকে কল্যাণেশ্বরী দেবী দেখা যায় না, হাঁটুর তলা থেকে পদযুগল পুজো হয়। এখানে দেখা যায় সিঁদুররঞ্জিত বৃহৎ পাথর, যা বড়বুড়ি নামে পরিচিতা। উর্বরতার দেবী হিসেবে

দেবী পূজিতা হন। অনেকে বলেন, বড়বুড়িই পরবর্তীকালে দেবী কল্যাণেশ্বরী নামে পরিচিতা হন। কল্যাণী 'মায়ের স্থান' থেকে মাইথন' নামের উৎপত্তি। এই দেবীর উপাসক সব জাতি গোষ্ঠী, দেবী তাই সর্বসাধারণের।

কিলাবুড়ি ঃ বারাবনি থানার কেলেজোড়া বা কিলাজোড়া গ্রামটির গ্রামদেবী কেলেবুড়ি বা কিলাবুড়ি। এই গ্রামের উত্তর দিকে একটি ছোট নদীর তীরে একটি তেঁতুল গাছের তলায় কিলাবুড়ির থান। এটি সম্ভবত বৌদ্ধ দেবী, কারণ একটি ঢিপির উপর বেশ কিছু ভাঙা পাথরের অংশ দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে পাথরের উপর খোদাই করা একটি সম্পূর্ণ বুদ্ধমূর্তি আজও রয়েছে। এ থেকে অনেকে অনুমান করেন এটি একটি বৌদ্ধ বিহারের অংশবিশেষ। এছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পোড়ামাটির ঘোড়া। বর্তমানে বাউরি ও ব্রাহ্মণ উভয়েই কিলাবুড়ির দেয়াশি, বার্ষিক পুজো হয় – পৌষ সংক্রান্তির দিন। এই সময় বিশাল মেলা বসে।

মুগরা বুড়ি ঃ কুলটি থানার অন্তর্গত আপার কুলটি সংলগ্ন গ্রাম পুনুড়ি, এই গ্রামের গ্রামদেবী মুগরাবুড়ি। এই গ্রামের উত্তর দিকে একটি বেলগাছের নিচে দেবীর অবস্থান ছিল। বছর ৭০ পূর্বে সেখানেই একটি চূড়াবিহীন একতলা মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের পাশেই আছে একটি পুষ্করিণী। মুগরাবুড়ির দেয়াশি 'মিশ্র' পদবিযুক্ত ব্রাহ্মণ। দেবীর বাৎসরিক পুজো হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় খুব ধুমধাম সহকারে। মুগরাবুড়ি গ্রাম রক্ষাকারিনী দেবী।

গুসাড়াবুড়ি ঃ কুলটি থানার অধীন গাঙুঠিয়া গ্রামের গ্রামদেবী গুসাড়াবুড়ি। একটি ফাঁকা মাঠে আঁখড়া গাছের তলায় তিনি বিরাজ করেন। দেবীর প্রতীক কালো রঙের ডিম্বাকৃতি এক থেকে দেড় ইঞ্চি সাইজের কয়েকটি শিলা। দেবীর নিত্য পুজো হয় না। তবে কেউ পুজো দিতে চাইলে দেয়াশী তৎক্ষণাৎ তার ব্যবস্থা করেন। এর দেয়াশি বাউড়ি সম্প্রদায়ের মানুষ। মোরগ বলির বিধান আছে, পাঁঠাবলির প্রথা নেই। অনেকে দেবীকে মদ্যও নিবেদন করেন। এছাড়া নৈবেদ্য হিসেবে দেওয়া হয় চিড়া, গুড়, পেড়া, কলা, দুখ ও ফলমূল। বাৎসরিক পূজা হয় পৌষ সংক্রান্তিতে। প্রচুর লোক সমাগম হয়, তবে মেলা হয় না।

পানুড়িয়া বুড়ি ঃ বারাবনী থানার অন্তর্গত পানুড়িয়া গ্রামের গ্রামদেবী পানুড়িয়া বুড়ি। গ্রামের উত্তর পশ্চিম দিকে একটি পাথরের টিলায় গাছ গাছালির স্নিগ্ধ ছায়ায় একদিকে ভাঙা পাথরের স্তূপ এবং অন্যদিকে স্তূপাকৃত পোড়া মাটির ঘোড়া। দেবীর কোনো মন্দির নেই, প্রতীক পোড়ামাটির ঘোড়া। পানুড়িয়া বুড়ির

নিত্যপূজা হয় না। তবে শনি ও সংক্রান্তির পরের দিন দেবীর বাৎসরিক পুজো হয়। বাৎসরিক পুজোয় পাঁঠাবলি হয়। দেবীর ভোগ জুড়ি, তা ছাড়া নৈবেদ্য হিসেবে দেওয়া হয় কলা, আপেল, পেড়া, বাতাসা ইত্যাদি ফল ও মিষ্টান্ন দ্রব্য।

কুমোড় বুড়ি ঃ বারাণসী থানার অন্তর্গত খোড়াবড় গ্রামের গ্রাম-অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কুমোরবুড়ি। জামগ্রাম থেকে খোড়াবড়গামী দক্ষিণমুখি রাস্তার পাশে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় থাকেন কুমোরবুড়ি। দেবীর প্রতীক পোড়া মাটির খোড়া ও সিঁদুর লিপ্ত পাথর। দেবীর কোনও মন্দির নেই। এই গ্রামে কর্মকারের সংখ্যা বেশি, তবে পুজো করেন ঘোষ পদবিযুক্ত গোয়ালা জাতির লোকেরা। দেবীর নিত্য পুজো হয় না, আখান পরবের দিন বাৎসরিক পূজা ও মেলা হয়। ঘোড়াবড়ের পশুপতি ঘোষের বংশধরেরা গোরুর রোগ-ব্যাধির ঔষধ দেন কুমোর বুড়ির আশীর্বাদ নিয়ে, কারণ তিনিই গো-মড়কের শান্তি বিধান করেন। সে জন্য মানত করতে হয়।

সাঁতাই বুড়ি ঃ বারাবনী থানার অন্তর্গত ইটাপাড়া গ্রামের দেবী সাঁতাই বুড়ি। এই গ্রামের সাঁতাই বিলের পাশেই দেবীর অবস্থান। মন্দির বিহীন সাঁতাই বুড়ির প্রতীক সিঁদুর রঞ্জিত পাথর ও পোড়ামাটির ঘোড়া। পুজো করেন বাউরি সম্প্রদায়ের মানুষ, নিত্যপুজো হয় না, প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবারে বিশেষ পুজো হয়। মনস্কামনা পূর্ণ হলে আখানের দিন অনেকে পুজো দিতে আসেন। সেদিন বহু বলিদান ও মেলা হয়। দলে দলে সাঁওতালরা আসে নাচ-গান করতে। এলাকাটি নৃত্য-বাদ্য-গীতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

ঝইরা বুড়ি ঃ কুলটি থানার অন্তর্গত ছোটধামা গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঝইরা বুড়ি। দেবীর কোনও মন্দির নেই। একটি মজা পুকুরের উপর তিনি বিরাজ করেন। দেবীর থানের চারিদিকে ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি। দেবীর কোনও প্রতীক নেই। একটি মাটির ঢিবি আছে ঝোপঝাড়ে ভর্তি হয়ে। দেবীর গুরুত্ব ম্রিয়মান। আগে নিয়মিত পুজো হত, দেয়াশি ছিলেন 'মাল' পদবি যুক্ত পরিবার। বর্তমানে দেয়াশি নেই, পুজোও ঠিক মত হয় না; কারোও মানতে ফল লাভ হলে নিজ উদ্যোগে পুজো দেন খিচুড়ি, চিড়ে, গুড়, দুধ, কলা ও পেড়া নিবেদন করে।

লীলাবুড়ি ঃ আসানসোলের অতি সন্নিকটে গাঁড়ুই গ্রামের পূর্বদিকে গাঁড়ুই নদীর দক্ষিণে খেতের মাঝে একটি পুরানো ছাতি গাছের নিচে লীলাবুড়ির অবস্থান। তিনি এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীর কোনও মন্দির নেই, দেবীথানের আশেপাশে

পড়ে আছে ভগ্ন মন্দিরের স্তূপ, ভাঙা পাথর, ভাঙা রথচক্র ইত্যাদি, লীলাবুড়ির একটি মাথাভাঙা প্রস্তরমূর্তি আছে, একটি গোলাকার শিলা ঘাড়ের উপর চাপিয়ে মাথা হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে। শিলা মূর্তিটি সিঁদুর লিপ্ত। আখানের দিন ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়ে যেমন, শ্রাবণ মাসে পাখি-ছাদল পূজা, ভাদ্র মাসের চাপড়া ষষ্ঠী পূজা ও জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় অরুণ ষষ্ঠী পূজা। ষষ্ঠী পূজায় গ্রামের ব্রাহ্মণ মহিলাদের সঙ্গে অন্যান্য জাতির মহিলারাও সেখানে পূজা দেয়।

নুনিবুড়ি ঃ আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত নুনি এবং চিচুঁড়িয়া গ্রাম দুটির মাঝে খোলা মাঠে প্রাচীন একটি গাছের নিচে নুনিবুড়ির অবস্থান। দেবীর কোনও মূর্তি নেই। তাঁর প্রতীক শিলা। সেই সঙ্গে রয়েছে পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া। বছর পনেরো পূর্বে ধাদকার সিন্ধিয়া পরিবার দেবীর মন্দির তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। দেবীর নিত্য পূজা হয় না। বাৎসরিক পূজা পৌষ সংক্রান্তির পরের দিন হয়। পূজার ভোগ হল মিষ্টান্ন, ফলমূল ও খিচুড়ি। মানত শোধের সময় ছাগ বলি হয়।

ধাদকাবুড়ি ঃ আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত ধাদকা গ্রামের গ্রামদেবী ধাদকাবুড়ি। দেবীর কোনো মন্দির নেই। সিঁদুর লিপ্ত পোড়ামাটির ঘোড়া দেবীর প্রতীক। দেবীর নিত্য পুজো হয় না। বাৎসরিক পুজো হয়। পৌষ সংক্রান্তির আখানের দিন। পায়াসান্ন, খিচুড়ি, মুড়ি ও ছোলাভাজা দেবীকে নৈবেদ্য হিসেবে দেওয়া হয়। পশুবলি হয়, তবে নিয়মিত নয়।

ভুড়তুড়াবুড়ি ঃ কুলটি থানার অন্তর্গত যশাইডি গ্রামের অনতি দূরে মাহাতাড়ি মৌজার অধীন ফাঁকা ধান জমিতে বিরাজ করছেন গ্রামদেবী ভুড়তুড়াবুড়ি। দেবীর কোনো মূর্তি বা মন্দির নেই। খেতের মাঝে এই গর্তে একটি প্রস্রবণ দেবীর প্রতীক। দেবীর আবাসস্থল ও সংলগ্ন এলাকাটি মাহাতাড়ি নামে পরিচিত। দেবীর নিত্যপুজো নেই, বাৎসরিক পুজো হয় আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে। পুজোয় পাঁঠাবলির প্রথা নেই। দেবীকে পায়েস, চিড়া, গুড়, দুধ, কলা, পেড়া, ফলমূল ভোগ দেওয়া হয়। বাৎসরিক পুজোয় মেলা হয় না।

বোমভানী বুড়ি ঃ কুলটি থানার অন্তর্গত বরাকরের বিখ্যাত জৈন মন্দিরের পিছনের বাউরি পাড়ায় গ্রামদেবতার নাম 'বোমভানী বুড়ি'। একটি পাথরের উলঙ্গ দেবীমূর্তি বোমভানী বুড়ি নামে পূজিতা হন। এই দেবীর পূজা করেন দেওঘরিয়া ব্রাহ্মণ। বর্তমানে বাউড়িদের ষোলআনার পক্ষ থেকে পূজা এবং একটি পাঁঠা বলিদানের ব্যবস্থা আছে। বাৎসরিক পুজো হয় বৈশাখ পূর্ণিমায়।

ঝগড়ি বুড়ি ঃ কুলটি থানার অধীন হাতিনল গ্রামের পূর্ব ও দক্ষিণ কোণে মাঠের মধ্যে প্রাচীন একটি আমগাছের তলায় ঝগড়িবুড়ি থান। কোনও দেবীমূর্তি নেই। দেবীর প্রতীক পোড়ামাটির ঘোড়া। দেবীথানের দক্ষিণ দিকে ইঁটডোবা। অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার সময় এই দেবীর পুজো হয়। পুজোর সময় অন্যান্য ভোগসামগ্রী সহ পাঁঠা বলি হয়।

রোশনা বুড়ি ঃ বারাবনি থানার অন্তর্গত রোশনা গ্রামের গ্রামদেবী রোশনাবুড়ি। দেবীর কোনও মূর্তি নেই। শিলাখণ্ড ও পোড়ামাটির ঘোড়া তাঁর প্রতীক। দেবীর কোনও মন্দিরও নেই। একটি মহুয়া ও একটি প্রাচীন শালগাছের নিচে তাঁর অবস্থান। দেবীর থানের চারপাশ জঙ্গল এবং সামনে একটি পুকুর। দেবীর নৈবেদ্য চিড়ে, কলা, নানা প্রকার ফল ও মিষ্টান্ন দ্রব্য। এছাড়া আছে মায়ের উদ্দেশ্যে ছাগ বলি। অনেকে মানত করে এবং মানত শোধের জন্য পাঁঠা বলি দেয়। দেবীর নিত্য পুজো নেই। বাৎসরিক পুজো ১ মাঘ। বাৎসরিক পুজো উপলক্ষ্যে একদিনের মেলা হয়।

খাজরাবুড়ি ঃ আসানসোল উত্তর থানার গাঁড়ুই গ্রাম সংলগ্ন ধান খেতের মাঝে একটি প্রাচীন গাছতলায় এই গ্রামের গ্রামদেবী খাজরাবুড়ি'র অবস্থান। দেবীর প্রতীক শিলা। কোনও মন্দির নেই। দেবীর নিত্যপুজো হয় না। বাৎসরিক পুজো হয় মকর ও শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। এছাড়া কেউ কেউ শনি ও মঙ্গলবারে পুজো দেয়। গ্রামের অন্যান্য দেবদেবীর পূজারিরাই এই দেবীর পুজো করেন। দেবীর পূজাপচার ফুল, ফল ও মিষ্টান্ন। আখানে পশুবলি হয়। সে সময় পিঠে, ফল ও মিষ্টি ভোগ দেওয়া হয়। এককালে এই দেবীর জাঁক ছিল, এখন কিছুটা অবহেলিত।

বীণাবুড়ি ঃ জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত পরিহারপুর গ্রামের পূর্বদিকের শেষ প্রান্তে গ্রামদেবী বীণাবুড়ির থান। ইনি পরিহারপুর গ্রামে আদিম জনজাতি বাউরি, মুচি ও ডোমদের দ্বারা পূজিতা। বীণাবুড়ির থানে যে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়, সেই মাংস গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বীণাবুড়ির থানে খিচুড়ির সঙ্গে পাঁঠার মাংস মিশিয়ে রান্না করে ভক্তরা খান। তিনি গ্রাম রক্ষাকারী এবং সর্বাধিক কল্যাণদাত্রী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যজন্তুর আক্রমণ, সর্পাঘাত, শারীরিক রোগ ব্যাধি বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেন। সুতরাং দেবীর কৃপা পেতে দেবীর সমীপে তাঁরা মানত করেন। মনস্কামনা পূর্ণ হলে মানত শোধ করেন। দেবীর কাছে ছাগ বলি দেন। কৃচ্ছ্রসাধন করে দেবীকে তুষ্ট করেন।

বর্ধমান জেলার লৌকিক দেব-দেবীর থানে ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছি তাদের মধ্যে বাবা বোকাপাহাড়ি, আংসিং বাংসিং, আঁদড়া ঠাকুর, কাণ্ডেশ্বর প্রভৃতি পুরুষ দেবতা রয়েছেন, তেমনি রংকিণী, দিদি ঠাকরুণ, সতীমা, যোগাদ্যা, ঝংকেশ্বরী, আরখাই চণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, ডাকাইচণ্ডী, মুক্তাইচণ্ডী, কর্কট নাগ, বড়কান বুড়ি, বীণাবুড়ি প্রভৃতি বৈচিত্রপূর্ণ নামে স্ত্রী দেবীরাও রয়েছেন। এই সকল দেব-দেবীগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণি বা নিম্নবর্ণের মানুষের দ্বারা পূজিতা হন। এই সমস্ত দেবতাদের পুজোর জন্য সবসময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্রীয় দেবতারা স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ বা দেবলোকে বসবাস করেন, অর্থাৎ মানুষের কাছাকাছি থাকেন না, কিন্তু লৌকিক দেবতারা থাকেন মর্ত্যে মানুষের কাছাকাছি আপনজন হয়ে। অনেকক্ষেত্রে লৌকিক দেবতাদের শাস্ত্রীয় দেবতার অন্তর্ভুক্ত করে পুরাণকাররা দেবতাদের আর্যীকরণ করেছেন, যেমন মনসাকে শিবের কন্যা হিসেবে প্রচারের মধ্যে শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি দেবার চেষ্ট হয়েছে। একইভাবে অনার্য দেবী শাস্ত্রীয় দেবতার লক্ষণও খুঁজে পাওয়া যায়। বাগ্‌দীদের লৌকিক দেবী কালি থেকে তান্ত্রিক দেবী কালীর ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালির কাছে কালি কেবলমাত্র তান্ত্রিক বা শক্তিদেবী নন, তিনি কখনও মাতা, কখনও কন্যা, কখনও প্রণয়িনী রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। তিনি বিভিন্ন রূপে ভক্তদের দেখা দিয়েছেন। তাইতো রামপ্রসাদের আদ্যাশক্তি কালি বেড়া বাঁধার সময় বেত ফিরিয়ে দিয়ে সাহায্য করলেন। এখানে দেবী কন্যার ছলে রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধতে সাহায্য করেছেন, এটি জানতে পেরে রামপ্রসাদ আফশোষ করলেন। এই কন্যা ও পিতার যে সম্পর্ক, দাবী; আবদার তা কেবলমাত্র লৌকিক দেবতার ক্ষেত্রেই সম্ভব, শাস্ত্রীয় দেবতার ক্ষেত্রে নয়।

তথ্য সূত্র ঃ

১. এককড়ি চট্টোপাধ্যায় – বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০১।

২. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু — বাংলার লৌকিক দেবতা - দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৪।
৩. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় — পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১।
৪. মিহিরচৌধুরী কামিল্যা — আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।
৫. নন্দদুলাল আচার্য — রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩।
৬. সোমা মুখোপাধ্যায় — রাঢ়বঙ্গের লোকমাতৃকা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪।
৭. বিভিন্ন সময়ে লৌকিক দেবদেবীর থানগুলিতে নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা।
৮. বিশেষ কৃতজ্ঞতা ঃ বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র, জি. এন. মিত্র লেন, বর্ধমান।

লেখক : গবেষক, প্রাবন্ধিক ও বহুবিধ গ্রন্থপ্রণেতা।